PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

বাংলা কবিতায় নদী: নদীর কবিতায় বাংলাদেশের শরীরী প্রত্যয়

সুফল বিশ্বাস [1*]

[1*] সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইলঃ suphalkrish@gmail.com

বিমূর্ত: বাংলার বিচিত্র ভূপ্রকৃতিতে নদী আসলে শুধুমাত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য নয়, সে আসলে জীবন ও অনুভূতিরই একটি অংশ। প্রধানত নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো মানুষের বসতি। শহর, নগর, বন্দর পৃথিবীর সকল সভ্যতার সূচনা নদীরই আদরমাখা কোলে। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই নদীর কাছে মানব সভ্যতার ঋণ অপরিসীম। নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, ভূমধ্যসাগরের তীরে ইজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীকে মান্যতা দিয়েই। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। মানব শরীরে সচল রক্তশিরার মতো নদীও এ দেশের প্রাণ। আমাদের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সংগ্রামে নদীর সার্বিক উপস্থিতি নদীকে যেমন চরিত্র করে তুলেছে তেমনি নদী হয়ে উঠেছে সমস্ত আশা নিরাশা তাড়িত অনুভূতি প্রকাশের ধাত্রী মা। গত শতকের ষাটের দশকে হাজার বছরের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তিকামী তরুণরা যে স্লোগান দিয়েছে সেখানেও আছে নদীকেন্দ্রিক পরিচয়ের প্রাধান্য,

'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা
তোমার আমার ঠিকানা।'

এ শুধু শ্লোগান নয়, নদীকেন্দ্রিক জন্মভূমির প্রতি এক প্রবল জীবনাবেগ এক নিজস্ব সত্ত্বা রক্ষার অঙ্গীকার। বাংলা কবিতায় কবির কলমের তুলিকায় কিভাবে আঁকা হয়েছে বাংলা নদী অনুভূতি তাকেই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে আলোচ্য পত্রে।

চুম্বক শব্দঃ কবিতা, সভ্যতা, আধুনিক, মানুষ, নদী, জীবন, আত্মা, জল, মাটি

"I am the river become night.
I go down by the broken depths,
by the forgotten unknown villages,
by the cities crammed to the very windows with people.
I am the river,
I flow through the prairies.
The trees on my banks are alive with doves.
The trees sing with the river,
the trees sing with my bird's heart,
the rivers sing with my arms."
(The River : Javier Heraud Translate by Timothy Allen)

'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ
তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।'
(১৪ নম্বর চর্যা : ডোম্বীপা)

বরাবর বাংলা কবিতার নাভিমূলে নদীর সর্বাঙ উপস্থিতি সাহিত্যের জন্ম লগ্ন থেকেই ধাত্রীর মতো চরিত্র হয়ে দীপ্যমান। নদী, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনজীবন ও কবিতা যেন একইসূত্রে গাঁথা কোনো এক অবশ্যম্ভাবী প্রত্যয় যা আজো সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নদী বিশেষ অর্থে বাংলাদেশ এবং ব্যপক অর্থে পৃথিবীর নানা সাহিত্যে বারবার যেন জীবন্ত চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কত ব্যথা কত কথা কত অনুভূতি যে তাকে কেন্দ্রে রেখে যুগের পর যুগ ধরে যে বল্লরিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শ্যামলে শাদ্বলে ঘেরা বাংলাদেশ বোধহয় সেই নদিকেন্দ্রিক মায়ামেলার স্বর্ণভূমি। নদীর গতিময়তা, উদ্দাম ঢেউ, ভাঙন আর তার বুকের পলি জমেই যে সবুজ-শ্যামলা,শস্য-সুফলা বাংলাদেশ তার প্রতিটি নদীকেন্দ্রিক নৈসর্গিক বস্তু ও বিষয় হয়েছে এই অঞ্চলের মানব মানবীর হৃদয়ের নানা জলাচল রেখা । বাঙালির আবেগপ্রবণতা, ক্রোধ, ঘৃণা, অভিমান অনেকটাই নদী নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি বাংলা কবিতার যে উদ্দাম আবেগী উত্থান, ছন্দের অভিনব দোলা তার আঙ্গিক ও অস্তিত্ব সব কিছুরই যে নিরন্তর ভাঙাগড়াতার পেছনে যে নদীর ক্রিয়াশীলতা তা কবিশ্রেষ্ঠ বারবার স্বীকার করেছেন ।

"ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এ ভুবনমেখলা।
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা,
নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি
বক্ষ তোর উঠে রণরনি"।
("হে বিরাট নদী"- রবীন্দ্রনাথ)

প্রাচীন যুগ তো বটেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নদী সবসময় সমাসোক্তির হাত ধরে কবির কলমে একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে ধরা দিয়েছে। মধ্যযুগের প্রধান সাহিত্যধারাগুলো অনেকটাই নদীর পাবনী জলে পরম আবেগে উছ্বলিত -উদ্বেলিত। মধ্যযুগের প্রথম আখ্যানকাব্যের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন সাধনায় নদীর সর্বাঙ্ উপস্থিতি বারবার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কালিদহ, যমুনা নদীর উপস্থিতি কাব্যের কাহিনীর নানা ঘাত প্রতিঘাতে কি ভুমিকা নিয়েছে সচেতন পাঠকমাত্রেরই তা জানা। কৃষ্ণ রাধার মন জয়ের নানা চেষ্টায় সুবিধা করতে না পেরে নৌকানিয়ে মাঝি হয়ে হাজির হয়। রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ঘৃত দধি ঘোলের পসরা মাথায় নদী পার হতে আসে। রাধাকে পার করতে গিয়ে কৃষ্ণ কৌশলে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গসুখ লাভের চেষ্টায় নিজের প্রেমের ফাঁদ পেতে রাখে। চতুর প্রেমিক কৃষ্ণ যমুনার জলে যাতে প্রণয়ী রাধার সঙ্গে মিলনের পরিবেশ তৈরি করতে পারেন কবি নদীরকৌশলী ব্যবহারে তারই সুযোগ করে দেন-

'কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে
বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে
এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে।'
(নৌকা খণ্ড: বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য)

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সাহিত্য প্রকরণ বৈষ্ণব পদাবলি আসলে যমুনার কালো জলে নিয়ত ছায়া ফেলা এক মোহন পুরুষের কাজল কালো আয়ত চোখের প্রতি এক প্রেমিকার গেরুয়া অনুভব। যমুনা, কৃষ্ণ ও রাধার হৃদয় যেন একই সূত্রে একই আঘাটায় এখানে বাঁধা পড়েছে যার সাক্ষী কখনোচণ্ডীদাস কখনোবা বিদ্যাপতি-

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকনকালা করিয়াছে থানা।
নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঁই জলে যেতে করি মানা।(চণ্ডীদাস)

তীর তরঙ্গিনী কদম্ব কানন
নিকট জমুনা ঘাটে।
উলটি হেরইত উলটি পরল
চরণ চীরল কাঁটে। (বিদ্যাপতি)

দুটি উদ্ধৃতিই যেন যমুনার জলে সিক্ত শঙ্খ বণিকের করাত দিয়ে ফালাফালা করা রক্তাক্ত প্রেমিকার হৃদয় বিতানের প্রেম পলাশ রঙা প্রেম যন্ত্রণার অন্য এক অনুভব।শুধু বৈষ্ণব পদাবলী নয় গোটামধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, রোম্যান্টিক প্রণয় উপাখ্যান ও মৈমনসিংহ গীতিকায় নদীর সরব উপস্থিতি দেখে বারবার মনে হয় নদী আর মানুষ যেন একে অপরের পারস্পরিক পরিপূরক। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদা সাধারণ গৃহিণীর বেশে নদী পার হতে এলে নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনি তাকে কুলপরিচয় জিজ্ঞেস করে একলা নদীর ঘাটে আগমনের কারণও জানতে চায়। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ সহজ হয়ে ওঠে-

‘পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার।’

উত্তরে দেবী অন্নদা বলেন-

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
(অন্নদামঙ্গল : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র)

একই সঙ্গে নদীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ছবিও ফুটে ওঠে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের নদীর প্রবর্তনা আধুনিক বাংলাসাহিত্যের শিরায়ও সমানভাবে বহমান। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাসাহিত্যের অন্যতম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কপোতাক্ষ নদ’’কবিতা ও তাতে উল্লিখিত নদীর প্রতি তার ভালোবাসা আজো আমাদের মননে স্পন্দন তোলে। সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে তিনি কপোতাক্ষ নদের মায়ামন্ত্রধ্বনি শুনেছেন হৃদয়ের গভীরে-

'সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।'
(কপোতাক্ষ নদ)

শৈশবের কপোতাক্ষ নদ যে তার সত্তায় নতুন ব্যঞ্জনায় ধরা দিয়েছে তা তিনি স্বীকারও করেছেন-

'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে?'

কবি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, অপরূপ বহু নদীর স্পর্শ লাভ করেছেন; কিন্তু কপোতাক্ষ নদের স্নেহস্পর্শ বিস্মৃত হতে পারেননি। বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের মোহ কাটিয়ে মধুসূদনের স্বদেশমুখী অভিযাত্রার ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না তা বলা যেতেই পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতার হৃদয় নিঙড়ানো অনুভব।

'নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথি জোটে দলে দলে
তারা তারি মতো ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে
পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি।' (নদী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর))

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নদী কি কেন কেমন তা তার জীবনের শিলাইদহ পর্বকে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। নদীকে তিনি দেখেছেন মায়াময় চোখে আর গোটা সাহিত্য জীবনের নানা উত্থান পতনের অনুভবের গভীরে টের পেয়েছেন নদীর নিবিড় অস্তিত্ব। রবীন্দ্রসাহিত্য ভীষণভাবে বাঁক নেয় পূর্ববাংলার শিলাইদহ শাহজাদপুরে জমিদারি পরিদর্শনে আগমনের পর। পদ্মায় বোটে বসে তিনি বাংলার নদী, জ্যোৎস্না ও জনজীবনকে অবলোকন করেছেন গভীর এক প্রজ্ঞায়; যা তার সাহিত্যেও নতুন মোড় নিয়ে আসে। তার কবিতায় পদ্মা, ধলেশ্বরী, ময়ূরাক্ষী, কোপাই ইত্যাদি নদীর কথা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে নৈসর্গিক চরিত্র হয়েশব্দার্থের রূপ রস গন্ধ মেখে।

বিদ্রোহী কবিকাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ ও মানবিক আকুতি নদীর মধ্য দিয়ে নানা নতুন ব্যঞ্জনায় প্রকটিত। তার বহুল আলোচিত বিদ্রোহী কবিতায় গঙ্গোত্রীর ধারার উল্লেখ রয়েছে; যেখানে মুক্তপ্রাণের বন্ধনহীন আবেগের প্রতীক হয়ে ওঠে গঙ্গোত্রী-

'আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর'।

'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতায় 'গঙ্গা' মানবীয় আবেদনে দারুন এক উজ্জ্বল উচ্ছলতায় ধরা দেয়-

'ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার'।

'চিরঞ্জীব জগলুল' কবির কবিতায় শুধু স্বদেশ নয় এশিয়ারসিন্ধু আর আফ্রিকার নীল নদও ধরা দিয়েছে বিশ্বজনীন এক মানবীয় চেতনায়-

'সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে দু-তীরে ললাট হানি
ছুটিয়া চলেছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি!'
(চিরঞ্জীব জগলুল)

কবির কবিতায় নানা সময়ে নানা অনুভবে ধরা দিয়েছে দজলা, ফোরাত, পদ্মা, সুরমা, গোমতী, কর্ণফুলী ইত্যাদি নদীর অপরূপ সৌন্দর্য। প্রসঙ্গত মনে পড়ে কর্ণফুলীকে নিয়ে লেখাতাঁর চমৎকার অনুভব-

'ওগো ও কর্ণফুলী
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি'।

পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কথা এ প্রসঙ্গে না বললে সব আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। পল্লিজীবনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে নদীকে তিনি কবিতায় তুলে এনেছেন অপরূপ নানা শব্দার্থের আড়ালে। গ্রাম জীবনের সৌন্দর্য নদীর গতিবিধির ওপর কতটা নির্ভরশীল তা তার কবিতার প্রতি পরতে পরতে ধরা পড়েছে এক দারুন অনুভবে-

' গড়াই নদীর তীরে
কুটিরখানিরে লতা-পাতা-ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে'
(নীড়)

এছাড়া তাঁর 'নক্সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাহিনীকাব্যে নদীর ভূমিকা ঠিক কি তা সহৃদয় হৃদয়বান পাঠক মাত্রেরই জানা আছে।

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায় '

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নদী সুধু স্বপ্নময় সুন্দর নয় সে তাঁর কবিতারপালনহার। যার কাব্যনাভিমূলের পদ্মের উপর উপবিষ্ট সৃষ্টির মাতন। কবির চেতনায় বাংলা হয়ে ওঠে- 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা সবুজ করুণ'। কবি মনে প্রানে বিশ্বাস করেন যদি কোনো জন্ম থাকে তবে তিনি ধানসিঁড়ি নদীর তীরের বাংলায় ফিরে আসবেন। তাইরূপসার ঘোলা জলে যে কিশোর শাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায় তার মাঝে কবি নিজেকে খুঁজে পান। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে নদী, নারী, নক্ষত্র, প্রকৃতি আর স্বদেশ পৌরাণিক আবহে চিরন্তন রূপ নিয়ে ধরা দেয়। 'বাংলার মুখ আমি' কবিতায় 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা তার এই কল্পনার বাংলার রূপসৌন্দর্য অনবদ্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায়ফুটে উঠেছে -

'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়
শ্যামার নরম গান শুনেছিল- একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'

বাংলার নানা নদ-নদীর অনন্যরূপ এবং মায়া কাজল তার অসংখ্য কবিতারচোখে এনেছে স্বপ্নের নানা কল্পনা। তার কাছে নদী আসলে-

'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'।

কবিতায় তিনি নদীর তরল লাবন্যদর্পণে বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের নানা সম্পর্কের রসায়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। তার কবিতায় ধলেশ্বরী, কালিদহ, কীর্তিনাশা, কর্ণফুলী নদী অপরূপ রূপ লাবন্যে ভরা নারীর মূর্তিতে ধরা দিয়েছে-

বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে- যেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল'।

(এই পৃথিবীতে এক)

তিরিশের দশকের অন্যান্য কবির কবিতাতে নদী কম-বেশি উল্লেখিত হয়েছে বহুমাত্রিক রূপে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কবি বুদ্ধদেব বসু নদীমাতৃক বাংলাদেশের চমৎকার এক রূপ তুলে ধরেছেন-

'সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু !
আগে পদ্মায় চলো,
দুপুরের রোদে ঝলমলে জল
বয়ে যায় ছলোছলো'।

শব্দার্থের নান্দনিক কাঠিন্যে ঘেরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সারস্বত দালানেও নদীর কল্লোল চপল ঝংকার বেশ শোনা গেছে -'সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়'। আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় নদী এসেছে গ্রামীণ গা-খোলা সৌন্দর্যের আকুল টানে-

'গ্রামে যাও, গ্রামে যাও
এক লাখ হয়ে মাঠে নদী ধারে
অন্ন বাঁচাও'।

এই সময়ের অন্যতম আর এক প্রতনিধি স্থানীয় কবি বিষ্ণু দে কবিতার হৃদয়ে নদীর শ্যামল পল্লবিত ছায়া দেখতে পান-

' ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জিরায় তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে
তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের কাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে'(জল দাও)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় চল্লিশের আরেক শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদের একটি অসাধারন কবিতার কতগুলি চরণ যেখানে নদী মিশে গেছেদর্শনের কাব্যিক অবয়বে- বাংলা দেশের সব প্রধান নদী যেন সেখানে বসতি স্থাপন করেছে-

'পদ্মা, মেঘনার দেশ; চিত্রা, হেনা, তিতাসের দেশ
যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ আর
গোমতী, যমুনা , তিস্তা, মধুমতী, হরিণ-ঘাটার
বহমান গতিস্রোত খুঁজে ফেরে পূর্ণতা অশেষ।'
(সাত সাগরের মাঝি)

সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিবাদী চেতনায় নদীও যেন বিদ্রোহী ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে যায়-

'এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে'
(*চিরদিনের*)

সাম্যবাদের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীর সন্ধানে তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেয়ার বাসনায় উজ্জীবিত-

'আজকে হঠাৎ সাত-সমুদ্র তের নদী
পার হতে সাধ জাগে মনে'
(*মীমাংসা*)

চল্লিশের আরেক মার্ক্সবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেতনায়ও নদী নবপৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর আর নিষ্ফলা বর্তমানের আর্তনাদে মুখর-

'নদী থাকলে, নৌকা থাকলে হতো ভালো
তবে কি জানিস?বদ্ধস্রোত
নদীতে এখন শুধু ঝাঁঝি'
(*যা রে কাগজের নৌকো*)

তবু কবি আশাবাদী কারণ আশাহীন কবিতা কবির সৃষ্টিতে কোনোদিন বাসা বাধেনি। তিনি প্রবল আশায় বিশ্বাস করেছেন একদিন ঠিকই স্বখাতে ফিরবে নদী।

'নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তুমার কাছে?
হাত দিওনা আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছাড়িয়ে থাকে।' (নোলক- আল মাহমুদ)

নতুন দেশের খোয়াবনামা পড়তে চেয়েছিল একটি জাতি কিন্তু তা যখন শাসকের দমন নিপীড়নে মিথ্যা মরীচিকা মনে হয় তখন মানুষ নদীকে বেছে নিয়েছে যন্ত্রণার কথা বলার বন্ধু হিসাবে। নদী এখানে হয়ে উঠেছে হৃদয়ের ভার বিমোচনের সঙ্গী নিজের মনের কথা শোনার নির্ভেজাল মাধ্যম।

"তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতায় কবি শামসুর রাহমানকে আমরা চিনি আমাদের প্রানের কবি হিসাবে। তিনি নাগরিক চেতনার গভীরে নদীর ফল্গু প্রবাহ অনুভব করেছেন। বিরূপ সময় ও সমসাময়িক সমাজ পরিস্থিতি তার কবিতায় নদী চেতনায়প্রকটিত-

'জলজ দুপুরে কিংবা টইটুম্বুর রাত্তিরে নদী
যখন সঙ্গীতময় হয় সে আপন অন্তরালে
ভাসমান খুশি যেন'।

কবির মৃত্যুচেতনাতেও নদীর প্রবর্তনা পাঠক হিসাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে বারবার। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু সবকিছুই যে নদীর অনুভূতিনির্ভর। 'মৃত্যু' কবিতায় কবি যখন বলেন-

'মৃত্যু তুমি রাঙাও কেন চোখ?
একটি নদী হবেই গাঢ় শোক'

তখন বাঙালির নদীকেন্দ্রিক আবহমান বোধই যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

এই একই বাঙালীর বোধ খেলা করে সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার শরীরে–

'আবার ডাকলে পরে কিছুতেই স্বীকার হমুনা
বুকের পাষাণ নিয়া দিমু ডুব শীতল যমুনা।'

বাংলা কবিতায় নদী তার বিচিত্র ভঙ্গি, রহস্যময়তা ও আবেগী উন্মাদনায় নিত্য নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে বাঙালী জীবনের প্রাত্যহিকতার সূত্রে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এমন কবি বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যার কবিতায় একবার না একবার নদীর স্পন্দন শোনা যায়নি। নদী যে মানব সভ্যতার ধাত্রী তা মানুষের কবিতায় তার অপূর্ব স্তুতিতেই বোঝা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. The River : Javier Heraud *(Translate by Timothy Allen)*
২. চর্যাপদ – ১৪ সংখ্যক পত্র
৩. বলাকা কাব্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য- (নৌকাখণ্ড) বড়ু চণ্ডীদাস
৫. বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৬. অন্নদা মঙ্গল- রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র
৭. চতুর্দশপদি কবিতাবলী(কপোতাক্ষনদ) – মাইকেল মধুসূদন দত্ত
৮. বলাকা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯. নীড়- কবি জসিমুদ্দিন
১০. রূপসীবাংলা- জীবনানন্দ দাশ
১১. নদীর স্বপ্ন-বুদ্ধদেব বসু
১২. অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা
১৩. জল দাও- বিষ্ণু দে
১৪. সাত সাগরের মাঝি – ফারুক আহমেদ
১৫. নোলক- আল মাহমুদ